ISSN 1605-2021

লোক প্রশাসন সাময়িকী
দ্বাবিংশতিতম সংখ্যা,
মার্চ ২০০২/চৈত্র ১৪০৮

ঘূর্ণাবর্তে বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার কতিপয় সাম্প্রতিক বিতর্ক

আনোয়ার পাশা *

Local Government in Bangladesh Recent Controversy

Anowar Pasa

Abstract: *National governance in Bangladesh is highly centralized and elitist. In such a polity, Local Government Institutions (LGIs) are to play their vital roles to supply goods and services as well as the necessary inputs to the rural people effectively. But in Bangladesh, local government and other decentralized and participatory institutions have not been developed as relatively self-governing autonomous people's institutions. The civil and military governments have used the overall local government system to civilianize their military regimes and / or to build favorable networks of their supporters at grass roots. Hence, the Bangladesh local government system remained as one of the burning issues. There is a consensus among all concerned quarters about the need for strengthening local government and make it self-governing in the real sense. However, there are differences of opinions and also different solutions as to how to make it self-propelled. Against this backdrop, this article attempts to analyze the real local government scenario of the country; to articulate the cross-currents of opinions regarding local government system of the country; to justify the merits and demerits of different opinions; and finally to find a sustainable way out of the crisis through evolving a New Local Government System (NLGS).*

* সহকারী পরিচালক, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, কোটবাড়ী, কুমিল্লা।

ভূমিকা ঃ

আধুনিক রাষ্ট্রদর্শনে রাষ্ট্রকে পুলিশী রাষ্ট্র হিসেবে নয় বরং জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্র হিসেবেই বিবেচনা করা হয়। সুতরাং নাগরিকদের কল্যাণ ও মঙ্গলের জন্য রাষ্ট্রকে বহুবিধ কার্যাবলী সম্পাদন করতে হয়। এ গুলোর মধ্যে বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহ, জনস্বাস্থ্য সংরক্ষণ, রাস্তা-ঘাট মেরামত, স্থানীয় হাট-বাজার পরিদর্শন ইত্যাদির মত বিশেষ কিছু কার্যাবলী রয়েছে, রাজধানীতে বসে কোন সরকারের পক্ষে যেগুলো সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করা সহজসাধ্য নয়। এখান থেকেই স্থানীয় সরকারের প্রয়োজনীয়তা উদ্ভুত হয়। অতএব, আধুনিককালে সভ্য রাষ্ট্রের প্রত্যেক নাগরিকই জাতীয় সরকার ও স্থানীয় সরকার এ দু'টি কর্তৃত্বের অধীনে বসবাস করেন। এ দু'টি পৃথক কর্তৃত্ব সম্পর্কে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সাংবিধানিক কিংবা আইনগত নির্দেশনা থাকে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানেও উল্লেখ করা হয়েছে যে, ''রাষ্ট্র সংশ্লিষ্ট এলাকার প্রতিনিধিগণ সমন্বয়ে গঠিত স্থানীয় শাসন সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানসমূহকে উৎসাহ দান করিবেন ...'' (অনুচ্ছেদ ৯ : গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান)। রাষ্ট্র কর্তৃক স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাকে উৎসাহ দান করার কথা সংবিধানে ব্যক্ত করা হলেও স্থানীয় সরকার বিষয়ে সংবিধানে সুস্পষ্ট কোন নির্দেশনা নেই। ফলে যখন যে সরকার ক্ষমতাসীন হন সে সরকার নিজের মত করেই স্থানীয় সরকার বিষয়ে চিন্তাভাবনা শুরু করেন এবং স্থানীয় সরকার বিষয়ে ব্যাপক সংস্কার সাধনের নামে ব্যাপক হস্তক্ষেপ করতে শুরু করেন। এ সকল সংস্কার বা হস্তক্ষেপকে ঘিরে সরকার, রাজনীতিবিদ, একাডেমিক সার্কেল, উন্নয়ন সহযোগী সকল পক্ষের মনেই কিছু জিজ্ঞাসার উদ্ভব হয়; এবং জিজ্ঞাসার সূত্র ধরে তারা এ বিষয়ে বিতর্কে প্রবৃত্ত হন। বর্তমানেও দেশে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাকে কেন্দ্র করে এ জাতীয় একটি বিতর্ক চলমান রয়েছে। বর্তমান প্রবন্ধে চলমান এই বিতর্কের কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে আলোকপাত করার প্রয়াস থাকবে। প্রবন্ধের শেষাংশে উন্নয়ন প্রেক্ষিতে দেশের জন্য কল্যাণকর হয়ে উঠতে পারে এমন একটি বিকল্প স্থানীয় সরকার কাঠামো সংক্ষেপে তুলে ধরার চেষ্টা করা হবে।

স্থানীয় সরকার

সাধারণ অর্থে স্থানীয় সরকার বলতে একটি ভূ-খন্ডগত অসার্বভৌম সম্প্রদায় বুঝায় যাদের নিজস্ব বিষয় নিয়ন্ত্রণ করার মত প্রয়োজনীয় আইনগত অধিকার ও সংগঠন আছে। তবে, সামাজিক বিজ্ঞানের অপরাপর বিষয়সমূহের ন্যায়

স্থানীয় সরকারের সংজ্ঞা বিষয়েও পন্ডিত ও বিশেষজ্ঞদের মধ্যে কোন সাধারণ ঐকমত্য নেই। স্ব স্ব দৃষ্টিকোণ থেকে তাঁরা স্থানীয় সরকার প্রত্যয়টিকে ব্যাখ্যা করতে প্রয়াসী হয়েছেন। সামাজিক বিজ্ঞান কোষে স্থানীয় সরকার অর্থে বলা হয়েছে, ''এটি একটি সংগঠন - যা কেন্দ্রীয় অথবা প্রাদেশিক সরকারের কোন একটি ক্ষুদ্র এলাকায় সীমিত পরিমাণে দায়িত্ব পালন করে'' (International Encyclopaedia of Social Sciences, 1960: 451)। ভৌগলিক সীমারেখা এবং দায়িত্বের সীমিত পরিসরের ইঙ্গিত ছাড়া সংজ্ঞাটিতে স্থানীয় সরকার বিষয়ক সুস্পষ্ট কোন বক্তব্য নেই। আবার, ডন লকার্ড (Duane Lockard) স্থানীয় সরকার অর্থে আঞ্চলিক বা জাতীয় সরকারের পরিধিভুক্ত তুলনামূলকভাবে ক্ষুদ্র ভূ-খন্ডের মধ্যে সীমিত পরিসরে জননীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত সরকারি সংগঠনকে বুঝিয়েছেন। লকার্ড এক্ষেত্রে দৃষ্টান্ত দিয়েছেন যে, সরকারি সংস্থাসমূহের পিরামিডের নিম্নভাগে স্থানীয় সরকার; শিখরে জাতীয় সরকার; এবং মধ্যভাগে প্রদেশ, অঞ্চল, রাজ্য ইত্যাদির অবস্থান (Siddiqui, 1995: 3-4)। এক্ষেত্রে স্থানীয় সরকারকে জাতীয় সরকারের অংশ হিসেবে দেখিয়ে নির্দেশ করা হয়েছে যে, স্থানীয় সরকার মূলতঃ কেন্দ্রীয় সরকারেরই প্রসারিত হস্তবিশেষ। বলা বাহুল্য, স্থানীয় সরকারের গণতান্ত্রিক চরিত্রের সঙ্গে সংজ্ঞাটি সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। জাতিসংঘ প্রণীত সংজ্ঞায় স্থানীয় সরকারের একটি বিস্তৃত ব্যাখ্যা দিয়ে বলা হয়েছে, ''স্থানীয় সরকার কোন জাতি বা রাষ্ট্রের এমন একটি উপ-বিভাগ (subdivision)-কে বুঝায় যেটি আইনের আওতায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে; এবং সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে করারোপ কিংবা শ্রম আদায়সহ স্থানীয় বিষয়াদির উপর যার সুস্পষ্ট নিয়ন্ত্রণ রয়েছে। এ জাতীয় স্বত্তার নির্বাহী পরিষদটি নির্বাচিত হতে পারে কিংবা স্থানীয়ভাবে মনোনীতও হতে পারে'' (Alderfer, 1964:178) । এ সংজ্ঞাটি স্পষ্টতর হলেও স্থানীয় জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের শাসন ছাড়াও মনোনয়ন পদ্ধতিতে গঠিত পরিষদকে এখানে স্থানীয় সরকারের আওতাভুক্ত করা হয়েছে। পক্ষান্তরে, চার্লস ব্যারই (Charles Barratt) প্রদত্ত সংজ্ঞায় স্থানীয় জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত প্রতিনিধি ব্যবস্থার উপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। এ কারণে স্থানীয় সরকার সম্পর্কে চার্লস ব্যারই প্রদত্ত সংজ্ঞাটি বাস্তবের সঙ্গে অধিকতর সঙ্গতিপূর্ণ বলে মনে হয়। তাঁর মতে, স্থানীয় সরকার বলতে স্থানীয় জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত প্রতিনিধি দ্বারা পরিচালিত এমন স্থানীয় প্রতিষ্ঠানসমূহকে বুঝায় যাদের দায়িত্বাবলী নির্দিষ্ট ভৌগলিক সীমারেখায় সীমাবদ্ধ থাকে; দায়িত্বাবলী পালনের নিমিত্ত নিজস্ব আয়ের উৎস হিসেবে স্থানীয় কর ধার্য করতে পারে; যদিও জাতীয় সরকার জনস্বার্থে এই স্থানীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রতিষ্ঠা করে, তথাপি তারা জাতীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীনে কাজ করে বা জাতীয় সরকারের নিকট জবাবদিহি করতে বাধ্য থাকে (করিম : ১৯৯১) ।

'স্থানীয় সরকার' ও 'স্থানীয় স্বায়ত্বশাসিত সরকার'

উপর্যুক্ত প্রত্যয় দু'টি অনেক সময় একই অর্থে ব্যবহৃত হলেও এ দু'য়ের মধ্যে সুস্পষ্ট ব্যবধান ও পার্থক্য রয়েছে। নিম্নে সংক্ষিপ্তাকারে 'স্থানীয় সরকার' ও 'স্থানীয় স্বায়ত্বশাসিত সরকার' প্রত্যয় দু'টির পার্থক্য নির্দেশের প্রয়াস থাকবে:

প্রথমতঃ স্থানীয় সরকার হল রাষ্ট্রের ভৌগলিক এলাকাকে বিভক্ত করে ক্ষুদ্রতর পরিসরে প্রতিষ্ঠিত সরকার ব্যবস্থা। এ ক্ষেত্রে দৃষ্টান্ত হিসেবে বিভাগ, জেলা, ও থানা'র নাম উল্লেখ করা যায়। পক্ষান্তরে, স্থানীয় প্রয়োজন মেটাবার জন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এলাকায় প্রতিষ্ঠিত এবং আইনের মাধ্যমে ক্ষমতাপ্রাপ্ত সংস্থা হ'ল স্থানীয় স্বায়ত্বশাসিত সরকার। উদাহরণ হিসেবে জেলা পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা প্রভৃতির নাম উল্লেখ করা যায়।

দ্বিতীয়তঃ স্থানীয় সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের প্রত্যক্ষ এজেন্ট। এর স্বাধীন অস্তিত্ব ও কর্তৃত্ব নেই। স্থানীয় সরকারকে মূলতঃ কেন্দ্রীয় সরকারের প্রসারিত হস্তরূপে চিহ্নিত করা যায়। পক্ষান্তরে, স্থানীয় স্বায়ত্বশাসিত সরকারের স্বাধীন স্বত্তা ও নিজস্ব গন্ডীর মধ্যে নীতি নির্ধারণের কর্তৃত্ব রয়েছে।

তৃতীয়তঃ স্থানীয় সরকার ক্ষমতা বিভাজনের (Deconcentration of power) ফলে জন্মলাভ করে; অন্যদিকে, ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের (Decentralization of power) মাধ্যমে স্থানীয় স্বায়ত্বশাসিত সরকার বিকাশ লাভ করে।

চতুর্থতঃ স্থানীয় সরকারের ক্ষেত্রে নিজস্ব অর্থ সংস্থান ও নির্বাচিত প্রতিনিধি ব্যবস্থার অবকাশ নেই। পক্ষান্তরে, স্থানীয় স্বায়ত্বশাসিত সরকারের অন্যতম মৌলিক পূর্বশর্তই হ'ল প্রতিনিধি নির্বাচনের ব্যবস্থা এবং নিজস্ব অর্থ সংস্থানের ক্ষমতা। যেহেতু সাধারণ্যে 'Local Government' অর্থে 'স্থানীয় স্বায়ত্বশাসিত সরকার' প্রত্যয়টি জনপ্রিয় এবং গণতান্ত্রিক চেতনার সঙ্গেও বিষয়টি অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত সেহেতু বর্তমান আলোচনায় 'স্থানীয় সরকার' অর্থে 'স্থানীয় স্বায়ত্বশাসিত সরকার' বুঝানো হয়েছে।

স্থানীয় সরকারের যে বিষয়সমূহকে কেন্দ্র করে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা বিষয়ে জাতীয় পর্যায়ে বিতর্ক অব্যাহত রয়েছে সে সকল বিষয়ের মধ্যে অপেক্ষাকৃত

গুরুত্বপূর্ণ পাঁচটি বিষয় সম্পর্কে বর্তমান নিবন্ধে আলোকপাত করা হবে। বিষয়গুলো হল:

১. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান ও স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা;

২. স্থানীয় সরকারের স্তর সংখ্যা;

৩. উপজেলা পদ্ধতি পুনঃপ্রবর্তন;

৪. স্থানীয় সরকারের উপ-স্তর; এবং

৫. উপজেলা পরিষদে জাতীয় সংসদ সদস্যের ভূমিকা।

১. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান ও স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা

১৯৭২ খ্রিষ্টাব্দে গৃহীত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মূল সংবিধানের 'মূলনীতি' অংশের ১১ বিধিতে বলা হয়েছে ''...এবং প্রশাসনের সকল পর্যায়ে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত হইবে।'' রাষ্ট্র ও সরকার পরিচালনার ক্ষেত্রে এটি একটি সুস্পষ্ট নির্দেশনা। 'স্থানীয় শাসন' ভাগে সংবিধানের ৫৯ সংখ্যক অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, 'প্রজাতন্ত্রের প্রত্যেক একাংশের' স্থানীয় শাসনের ভার আইনানুযায়ী নির্বাচিত ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গঠিত প্রতিষ্ঠানসমূহের কাছে প্রদান করা হবে। সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশের জন্য ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দে যে সংবিধান রচিত হয়েছিল তাতে 'স্থানীয় সরকার' বা 'স্থানীয় শাসন' বিষয়ে স্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা ও বিধান ছিল (মোরশেদ ২০০২ : ৬)। দেশের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এবং নীতি নির্ধারকগণও একই মত পোষণ করেন। প্রকৃতপক্ষে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের বাংলা অংশে 'স্থানীয় সরকার' নামক কোন শব্দগুচ্ছই নেই। বরং সংবিধানে 'প্রজাতন্ত্রের প্রত্যেক একাংশের স্থানীয় শাসন' কথাগুলো বর্ণিত রয়েছে। আবার সংবিধানের ১৫২ সংখ্যক অনুচ্ছেদে 'প্রশাসনিক একাংশ' শব্দগুচ্ছের ব্যাখ্যা হিসেবে বলা হয়েছে, 'প্রশাসনিক একাংশ' অর্থ জেলা কিংবা এই সংবিধানের ৫৯ অনুচ্ছেদের উদ্দেশ্য সাধনকল্পে আইনের দ্বারা অভিহিত অন্য কোন এলাকা। এক্ষেত্রে স্থানীয় সরকারের সুনির্দিষ্ট কোন সংজ্ঞা নেই। ৫৯ অনুচ্ছেদেও স্পষ্ট কিছু বর্ণিত নেই। সুতরাং রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এবং নীতি প্রণেতাগণ যা-ই বিশ্বাস করুন না কেন, বাংলাদেশে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার অন্যতম মৌলিক পূর্বশর্তই হ'ল, সর্বাগ্রে স্থানীয় সরকারের সাংবিধানিক ভিত্তি সুদৃঢ় করা; এবং এর মাধ্যমে সুনির্দিষ্ট করা

যে, কোন্ কোন্ প্রশাসনিক একাংশ স্থানীয় সরকার হিসেবে গণ্য হবে; কোন্ কোন্‌টি স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান না হয়ে মাঠ প্রশাসনের অংশবিশেষ হিসেবে বহাল থাকবে। স্থানীয় সরকারের কোন্ কোন্ স্তরে নির্বাচিত প্রতিনিধি থাকবেন তাও সুস্পষ্ট করা উচিত।

দ্বিতীয়তঃ প্রতিটি প্রশাসনিক এককে নির্বাচিত 'স্থানীয় শাসন সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান' প্রতিষ্ঠার সাংবিধানিক বিধিটিও ত্রুটিপূর্ণ। কেননা, পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, 'প্রশাসনিক একাংশ' কিংবা 'স্থানীয় শাসন সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান' শব্দগুচ্ছ দু'টির সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা সংবিধানে নেই। সুতরাং দেশে প্রশাসনিক একক কয়টি ও কী কী সে বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। বর্তমানে গ্রাম, ওয়ার্ড, ইউনিয়ন, উপজেলা, জেলা, এবং বিভাগ এ ছয়টি এককে দেশের সাধারণ প্রশাসন ব্যবস্থা বিভক্ত। কিন্তু এ ছয় স্তরের বিভাগ, গ্রাম, এবং ওয়ার্ডে কোন নির্বাচিত স্থানীয় সরকার নেই। আবার, পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশন সংবিধান অনুযায়ী স্থানীয় সরকার না হলেও সেগুলোর ক্ষেত্রে নির্বাচিত পরিষদ রয়েছে। এভাবে দেখা যায় যে, সংবিধানের ৯, ১১, ৫৯ ও ৬০ এই কয়টি অনুচ্ছেদের সাথে দেশের প্রচলিত স্থানীয় সরকার আইন ও ব্যবস্থা মোটেই সঙ্গতিপূর্ণ নয়। তাই পুরো ব্যবস্থাটি বিবেচনা করে সংবিধানে নতুন বিধান আনয়ন বা পুরনো বিধানের সংশোধন প্রয়োজন। সংসদে নিরংকুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার সুবাদে বর্তমান সরকারের জন্য এ কাজটি কঠিন হবার কথা নয়; বরং এ জন্য সরকারের সদিচ্ছাই যথেষ্ট।

২. স্থানীয় সরকারের স্তর সংখ্যা

এককেন্দ্রিক শাসন ব্যবস্থায় শাসিত ছোট রাষ্ট্র বাংলাদেশে স্থানীয় সরকারের স্তর সংখ্যা নিয়ে বিগত তিন দশকে বিস্তর পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও বিতর্ক হয়েছে, এবং সে বিতর্ক এখনও চলমান রয়েছে। ১৯৭১-১৯৭৫ কাল পর্বে প্রথম আওয়ামী লীগ সরকারের শাসনামলে গ্রামীণ স্থানীয় সরকারের প্রাতিষ্ঠানিক স্তর ছিল তিনটি। যথা: ইউনিয়ন পর্যায়ে - ইউনিয়ন পঞ্চায়েত / পরিষদ; থানা পর্যায়ে - থানা উন্নয়ন কমিটি; এবং জেলা পর্যায়ে - জেলা বোর্ড। ১৯৭৬-১৯৮২ মেয়াদে প্রথম বিএনপি সরকারের শাসনামলেও স্থানীয় সরকারের তিনটি স্তর ছিল । যথা: ইউনিয়ন পর্যায়ে - ইউনিয়ন পরিষদ; থানা পর্যায়ে - থানা উন্নয়ন কমিটি; এবং জেলা পর্যায়ে - জেলা পরিষদ। ১৯৮২-১৯৯০ মেয়াদে জাতীয় পার্টির শাসনামলেও স্থানীয় সরকারের স্তর ছিল তিনটি। যথা: ইউনিয়ন পর্যায়ে - ইউনিয়ন পরিষদ; থানা পর্যায়ে - উপজেলা পরিষদ; এবং জেলা পর্যায়ে - জেলা পরিষদ। ১৯৯১-১৯৯৬

মেয়াদে দ্বিতীয় বিএনপি সরকার পূর্ববর্তী সরকারের হাতে সৃষ্ট জনপ্রিয় স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান উপজেলা পরিষদ বিলুপ্ত করে দেন। ফলে এ সময়পর্বে স্থানীয় সরকারের স্তর ছিল দ'টি । যথা: ইউনিয়ন পর্যায়ে - ইউনিয়ন পরিষদ; এবং জেলা পর্যায়ে - জেলা পরিষদ। স্থানীয় সরকারের স্তর সংখ্যার এ রকম নিয়মিত হ্রাস-বৃদ্ধির অন্তরালে শাসক গোষ্ঠীর রাজনৈতিক স্বার্থ সর্বদাই ক্রিয়াশীল ছিল এবং রয়েছে। একজন প্রবীণ রাজনীতিবিদ লিখেছেন, বাংলাদেশের স্বাধীনতার তিরিশ বছর হতে চলেছে। এই সময়কালে এ দেশে স্থানীয় সরকার নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা কম হয়নি। যখনই যে সরকার এসেছে তারা ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ ও স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাকে একটি স্থায়ী ও শক্ত ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠার কথা বলেছে। আর এই কথা বলেই পূর্ববর্তী সরকারের অনুসৃত স্থানীয় সরকার পদ্ধতির পরিবর্তন, পরিমার্জন, সংশোধন করেছে। নতুন ব্যবস্থা চালু করেছে। আবার সেই ব্যবস্থা বাতিল হয়েছে। স্থানীয় সরকারের ক্ষেত্রে এই উথাল-পাতাল পরিবর্তনের ফলে এ দেশের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা কোনও শেকড় নিতে পারেনি (মেনন : ২০০১)। ১৯৯৬-২০০১ কালপর্বে স্থানীয় সরকারের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য কাজ ছিল দেশে চার স্তর বিশিষ্ট স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা সংবলিত আইন প্রণয়ন। এ চার স্তর হ'ল: গ্রাম পর্যায়ে - গ্রাম পরিষদ; ইউনিয়ন পর্যায়ে - ইউনিয়ন পরিষদ; উপজেলা পর্যায়ে - উপজেলা পরিষদ; এবং জেলা পর্যায়ে - জেলা পরিষদ। তবে, শেখ হাসিনার শাসনামলে নতুন স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা কার্যকর করা সম্ভব হয়নি। ফলতঃ অক্টোবর ২০০১ এর সাধারণ নির্বাচনে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা অন্যতম প্রধান নির্বাচনী ইস্যুতে পরিণত হয়। প্রধান রাজনৈতিক দল বিএনপি ও আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহারে এই চার স্তরের স্থানীয় সরকারের অঙ্গীকার করা হয়েছে। নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী বিএনপি সরকার এখন চার স্তরের স্থানীয় সরকার আইন বাস্তবায়ন করবেন বলে জনগণ আশা করেন (জাহাঙ্গীর ২০০২খ : ৫)। সরকার এই প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের জন্য একটি 'মন্ত্রিসভা কমিটি'ও গঠন করেছেন। সে কমিটির ভেতরকার ব্যাপক মতভেদের কথাও ইতোমধ্যেই প্রকাশ পেয়েছে। কমিটির একাংশের অভিমত ''ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ ছাড়া প্রশাসন গতিশীল হবেনা, উন্নয়নও ব্যাহত হবে।'' আর একাংশের অভিমত ''উপজেলা ব্যবস্থা সংসদীয় পদ্ধতির সরকারে জটিলতা সৃষ্টি করবে'' (মাশরাফী ২০০২খ : ৫)। স্থানীয় সরকার বিষয়ক মন্ত্রিসভা কমিটির অধিকাংশ সদস্যসহ শাসকদলের মূল নেতৃত্ব উপজেলা পরিষদসহ চার স্তরের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার পক্ষে রয়েছেন বলেই প্রতীয়মান হয়। তবে, এ ক্ষেত্রে গ্রাম পরিষদের পরিবর্তে 'গ্রাম সরকার' পুনঃপ্রবর্তনের ব্যাপারেই তাঁরা বেশী আগ্রহী।

অনুমান করা যায় যে, স্থানীয় সরকারের স্তর সংখ্যা নিয়ে চলমান বিতর্কের আশু অবসান সহজ হবেনা। স্তর বিতর্কের অন্যপিঠে বিশেষজ্ঞ পর্যায়েও বিতর্ক অব্যাহত রয়েছে। কেউ কেউ অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, বর্তমানে প্রচলিত চার স্তর কাঠামো এখানে কখনও সফল হবেনা। কেননা, বর্তমান আইন কাঠামো অনুযায়ী এই চার স্তর কার্যকর হলে এদেশে ৪০ হাজার ৫০০ গ্রাম পরিষদ, ৪৪৭৬টি ইউনিয়ন পরিষদ, ৪৬৮টি উপজেলা পরিষদ, ৬৪টি জেলা পরিষদ, ২৫০টির অধিক পৌরসভা, ৬টি সিটি করপোরেশন ইত্যাদি মিলিয়ে প্রায় ৪৫ হাজার ৮০০টি বিভিন্ন আকারের স্থানীয় সরকার সংগঠন সৃষ্টি হবে। এভাবে দেশের নদীনালা, খালবিল, পাহাড়-পর্বত বাদে প্রায় প্রতি বর্গমাইলে গড়ে একটি স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি হবে। আর এসব সংগঠনে নির্বাচিত নেতার সংখ্যা হবে প্রায় ৪ লক্ষ ৫০ হাজার। অবশ্য এরই মধ্যে নতুন আইন করে দেশের ৮০ হাজার গ্রামে 'গ্রাম সরকার' গঠিত হলে সে অবস্থা আরও ভয়াবহ হতে পারে। এই বিপুল সংখ্যক প্রতিষ্ঠানের জন্য সরকারি অর্থায়ন, তদারক, তত্ত্বাবধান, প্রশিক্ষণ কতটুকু সম্ভব হবে তা প্রশ্নসাপেক্ষ' (আহমেদ ২০০২ : ৩১)।

এ সকল সমস্যার বাইরে আরও কিছু সমস্যার উদ্ভবও অনিবার্য হয়ে উঠতে পারে। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যাবলী বিষয়ে পারস্পরিক অধিক্রমণ (overlapping); সীমিত সম্পদের জন্য (স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে) তীব্র প্রতিযোগিতা; নির্বাচনী সংঘাত সংর্ঘষের ব্যাপক বিস্তার; স্থানীয় কর রাজস্বের উৎস বিভাজন ও আদায়ের কর্তৃত্ব নিয়ে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে আইনগত বিরোধ ইত্যাদি বিপজ্জনক মাত্রায় পৌঁছাতে পারে। তদুপরি, একভাষাভাষী (আদিবাসী ও উপজাতি বাদে) ও একই জাতিগোষ্ঠীর এবং এককেন্দ্রিক শাসন ব্যবস্থার তুলনামূলকভাবে ক্ষুদ্র একটি দেশে এ জাতীয় বহু স্তর পদ্ধতি আঞ্চলিক বিভাজনকে উৎসাহিত করতে পারে। গণদাবীর মুখে বিগত বছরগুলোতে নতুন করে দ'ুটি বিভাগ স্থাপন দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে নতুন বিভাগ প্রতিষ্ঠার আন্দোলন উস্কে দিয়েছে। জনদাবী পূরণের নামে নতুন নতুন স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান গঠনের পেছনে ক্রিয়াশীল রয়েছে শাসক গোষ্ঠীর কথিত জনতুষ্টিবাদ; স্থানীয় সরকারের নানা স্তরে নির্বাহী ক্ষমতা চর্চায় অতি উৎসাহী আমলাতন্ত্র; স্থানীয় পর্যায়ে ক্ষমতা কুক্ষিগত করতে ইচ্ছুক রাজনীতিবিদ; এবং নতুন নতুন প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠার ফলে বৈষয়িকভাবে লাভবান হবার সুযোগ পেতে পারেন এমন স্বার্থবাদী ব্যক্তি ও গোষ্ঠীসমূহের অপ্রকাশ্য একটি কোয়ালিশন।

স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের মাধ্যমে পল্লী উন্নয়ন এবং সার্বিক জাতীয় উন্নয়নের সূচনা ও পরিচালনা করতে হলে স্থানীয় সরকারের স্তর বিতর্কের ইতি টানা উচিত। এ লক্ষ্যে প্রথমতঃ মাঠ প্রশাসনের স্তর কিংবা প্রশাসনিক একাংশ হিসেবে বিদ্যমান বিভাগসমূহ বিলুপ্ত করে দেয়া উচিত। বিভাগীয় পর্যায়ের সকল সম্পদ, জনবল ও ক্ষমতা জেলা এবং উপজেলা পর্যায়ে ন্যস্ত করা উচিত। প্রশাসনিক এ স্তরটি মধ্য স্তরের কতিপয় আমলার জন্য পদ বিতরণ এবং ক্ষমতা চর্চার মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হওয়া ছাড়া গঠনমূলক কোন ভূমিকা পালনে সমর্থ হয়নি। ১৯৮২ খ্রিষ্টাব্দে গঠিত প্রশাসনিক পুনর্গঠন ও সংস্কার কমিটিও প্রশাসনিক একাংশ হিসেবে মহকুমা ও বিভাগ বিলুপ্তির যুগান্তকারী সুপারিশ করেছিলেন (আহমেদ ১৯৯৮ : ৬)। মহকুমা বিলুপ্ত করে তার পরিবর্তে জেলা গঠন করা হলেও সামরিক শাসকবর্গ কৌশলগত কারণেই বিভাগের উপর কোন প্রকার হস্তক্ষেপ করেননি।

নতুন আঙ্গিকে উপজেলা পরিষদ গঠনের পরিপ্রেক্ষিতে জেলা পরিষদেরও প্রয়োজন ফুরিয়ে যাওয়ার কথা এবং বিভিন্ন গবেষণায় জেলা পরিষদের দায়-দায়িত্ব ও সম্পদকে উপজেলা পরিষদসমূহের মধ্যে বিতরণ করে দিয়ে জেলা পরিষদকে বিলুপ্ত করার সুপারিশ করা হয় (Faizullah 1982 : 364-65)। এ ক্ষেত্রে অবশ্য মধ্যপন্থা হিসেবে জেলা পরিষদকে একটি আঞ্চলিক পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষ হিসেবে রূপান্তর করা যেতে পারে। এই পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষের অধীনেই ইউনিয়ন পরিষদের ইউনিয়ন পরিকল্পনা বই এবং উপজেলা পরিষদ কর্তৃক প্রণীত উপজেলা পরিকল্পনা বই এর সমন্বয়ে জেলা পরিকল্পনা বই প্রণয়ন করা যেতে পারে। থানা পর্যায়ে উপজেলা পরিষদই হবে সকল উন্নয়ন তৎপরতার কেন্দ্রবিন্দু এবং উপজেলার সমন্বিত উন্নয়ন কর্মযজ্ঞের মূল সমন্বয়কেন্দ্র। ইউনিয়ন পরিষদ কালের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ একটি প্রতিষ্ঠান। ইউনিয়ন পরিষদের ক্ষমতা বিভিন্ন সরকারি বিভাগ ও জেলা পরিষদের হাতে ন্যস্ত করার প্রবণতা বন্ধ করা হলে এ প্রতিষ্ঠানটি তৃণমূল পর্যায়ে গণতন্ত্র চর্চা ও উন্নয়ন তৎপরতার মূল কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হতে পারে।

গ্রাম পর্যায়ে স্থানীয় সরকারের কোন স্তর না থাকাই শ্রেয়। কেননা প্রাতিষ্ঠানিক ও প্রশাসনিক কারণে স্থানীয় সরকারের স্তর সংখ্যা বৃদ্ধি সমস্যা সমাধানের পরিবর্তে সমস্যাকে আরও জটিল করে তুলবে। প্রায় ৪০ হাজার ৫০০ গ্রাম পরিষদের কাজ কর্ম তদারক, মূল্যায়ন ও পরিবীক্ষণ করা দুঃসাধ্য। ইউনিয়ন পরিষদের কাঠামোর মধ্যে গড়ে তোলা গ্রাম পরিষদের জন্য অর্থ ও সম্পদের

যোগান কোন্ উৎস থেকে এবং কোন্ পন্থায় সম্ভব সে বিষয়েও বিপজ্জনক অনিশ্চয়তা রয়েছে। গোপন ব্যালট প্রথায় যেখানে নির্বাচন অনুষ্ঠান অত্যধিক ঝুঁকিপূর্ণ সেখানে গ্রামবাসীদের প্রকাশ্য সম্মেলনের মাধ্যমে গ্রাম পরিষদের সভাপতি ও সদস্যদের নির্বাচন আরও ঝুঁকিপূর্ণ হবে। আবার একটি ওয়ার্ডে কোথাও একাধিক গ্রাম থাকবে, কোথাও কোন গ্রামের অংশ বিশেষ নিয়ে ওয়ার্ড গঠিত হবে। এমতাবস্থায় চাপিয়ে দেয়া এই গ্রাম পরিষদ সনাতনী গ্রাম কাঠামোতে বিপর্যয় নিয়ে আসবে (আহমেদ ১৯৯৮ : ১৬২)।

৩. উপজেলা পদ্ধতি পুনঃপ্রবর্তন

উপজেলা পরিষদ ১৯৮২ খ্রিষ্টাব্দে সামরিক সরকারের হাতে সৃষ্ট একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান। উপজেলা ব্যবস্থার তাত্ত্বিক ভিত্তি ছিল কেন্দ্রীয় সরকারের নির্ধারিত ক্ষমতা স্থানীয় পর্যায়ে হস্তান্তর করা (Devolution of Central Government Authority) বা ক্ষমতার স্থানীয় পর্যায়ে বিকেন্দ্রীকরণ (সিরাজুদ্দীন ২০০২: ৫) । ১৯৮০'র দশকে বাংলাদেশে সূচিত প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ বিষয়ক সরকারি উদ্যোগকে এক ধরনের প্রত্যাশিত হস্তক্ষেপ বলে গণ্য করা যায়। কেননা, এ সময়কার প্রশাসনিক সংস্কার ও পুনর্গঠন উদ্যোগের ঘোষিত উদ্দেশ্যসমূহের মধ্যে ছিল-

- প্রশাসন ও উন্নয়ন ব্যবস্থার সঙ্গে সাধারণ মানুষের সম্পর্ক নিবিড় করা;
- রাষ্ট্রীয় সেবাসমূহকে অপেক্ষাকৃত কম সুবিধাভোগীদের কাছে সহজলভ্য করা;
- প্রশাসনে জবাবদিহিতা সৃষ্টি করা;
- আমলাতান্ত্রিকতা হ্রাস করে জনপ্রতিনিধিদের কর্তৃত্ব বৃদ্ধি করা;
- একটি গণতান্ত্রিক কাঠামো সৃষ্টি করা; এবং
- স্বশাসিত ও আত্মনির্ভরশীল স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা গড়ে তোলা যা ধীরে ধীরে কেন্দ্রীয় সরকারের উপর মাত্রাতিরিক্ত নির্ভরশীলতা কাটিয়ে উঠবে (পরিকল্পনা কমিশন : ১৯৮০)। এ সকল উদ্দেশ্যের যথাযথ বাস্তবায়ন হলে গ্রামের শক্তিহীনতা ও সম্পদহীনতার অবসান ঘটতে পারে।

বিকেন্দ্রীকরণের পেছনে দু'ধরনের উদ্দেশ্য ক্রিয়াশীল থাকে বলে ডায়না কণিয়ার্স উল্লেখ করেছেন (বদিউজ্জামান : ১৩৯৬)। প্রথম উদ্দেশ্যটি প্রকাশ্যে বলা হয়ে থাকে যাকে বলা যায় বিকেন্দ্রীকরণের প্রকাশ্য উদ্দেশ্য; দ্বিতীয় উদ্দেশ্যটি প্রচ্ছন্ন থাকে - যা মুলতঃ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জনা ব্যবহৃত হয়ে থাকে। উপজেলা ব্যবস্থার ঘোষিত লক্ষ্য অবশ্যই ইতিবাচক। এ ব্যবস্থার অনেকগুলো সুফল পাওয়া শুরু হয়েছিল এবং আশা করা হচ্ছিল যে, উপজেলা ব্যবস্থা কালের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে সক্ষম হবে। পক্ষান্তরে, উপজেলা পদ্ধতি প্রবর্তনের প্রচ্ছন্ন উদ্দেশ্যটি ছিল দেশের উপর সামরিক শাসক গোষ্ঠী কর্তৃক সার্বিক নিয়ন্ত্রণ আরোপ। শাসক এলিট গোষ্ঠী উপজেলার হাতে তাৎপর্যপূর্ণ কোন প্রকার স্বায়ত্তশাসন দিতে আগ্রহী ছিলেন না; যে কারণে উপজেলা পরিষদ শেষ পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকারের আর্থিক অনুদানের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। উপজেলা পদ্ধতির মাধ্যমে গ্রাম পর্যন্ত আমলাতান্ত্রিক জাল বিস্তৃত হয় এবং দলীয় সমর্থন বলয় সৃষ্টিতে তা ব্যবহৃত হয়।

১৯৯০ সালের শেষের দিকে ব্যাপক গণআন্দোলনের মুখে এরশাদ সরকারের পতন ঘটে এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনে জয় লাভ করে দ্বিতীয় বিএনপি সরকার গঠিত হয়। এ সরকার অজ্ঞাত কারণে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার প্রতি চরম অবহেলা প্রদর্শন করেছেন (আহমেদ ২০০২ : ২৪) । ২৪ নভেম্বর ১৯৯১ খ্রিষ্টাব্দে তদানিন্তন তথ্যমন্ত্রী ব্যারিষ্টার নাজমুল হুদাকে প্রধান করে গঠিত 'স্থানীয় সরকার কাঠামো পর্যালোচনা কমিশন' ইউনিয়ন ও জেলা পর্যায়ে দু'স্তর বিশিষ্ট স্থানীয় সরকার কাঠামো প্রবর্তনের সুপারিশ করেন। কিন্তু কমিশনের সুপারিশের আগেই ১৯৯১ এর নভেম্বরে প্রথমে উপজেলা চেয়ারম্যান পদ এবং পরে খোদ উপজেলা পরিষদই বিলুপ্ত ঘোষণা করা হয়। জনশ্রুতি রয়েছে যে, ১৯৯০ সালের উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে বিএনপি'র ব্যর্থতা; দলীয় নেতৃত্বের খেয়ালীপনা, রাজনৈতিক ও ব্যক্তিগত সহনশীলতার অভাব ইত্যাদির কারণেই মূলতঃ উপজেলার মত একটি সম্ভাবনাময় প্রতিষ্ঠানের অপমৃত্যু ঘটেছিল। কিন্তু দ্বিতীয় বিএনপি সরকার কর্তৃক উপজেলা পরিষদের বিলুপ্তির বিষয়টি একাডেমিক সার্কেলে সহজভাবে গ্রহণ করা হয়নি (আহমেদ ১৯৯৮ : ১৩২)। কেননা, উপজেলা পদ্ধতি বাতিলের স্বপক্ষে যত যুক্তিই থাকুক না কেন এ পদ্ধতি বাতিলের ফলে যে সকল আর্থ-সামাজিক প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে সেগুলোর তুলনায় এ সকল যুক্তি যথেষ্টই দুর্বল (Ali : 1995)। উপজেলা পদ্ধতি বাতিল করার ফলে যে সকল আর্থ-সামাজিক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে সেগুলোর কয়েকটি নিম্নে তুলে ধরা হল:

- উপজেলা পর্যায়ে সকল উন্নয়ন কর্মকান্ড বন্ধ হয়ে গিয়েছে এবং সরকারি তহবিল বরাদ্দ হ্রাস পেয়েছে।

- উপজেলা পর্যায়ে কর্মরত কর্মকর্তা কর্মচারীদের বিশাল বাহিনী কার্যত অলস, হতোদ্যম হয়ে পড়েছেন।

- থানা পর্যায়ে নগরায়ন প্রক্রিয়া স্তিমিত হয়ে পড়েছে; থানা সদরে জমির মূল্য হ্রাস পেয়েছে; এবং এর প্রতিক্রিয়া হিসেবে শহরমুখী জনস্রোত আরো তীব্র আকার ধারণ করেছে।

- উপজেলা পর্যায়ের উদ্যোক্তা, ঠিকাদার, ও ব্যবসায়ীগণ, যারা এতদিন বিপুল কলেবরের উন্নয়ন কর্মকান্ডে নিয়োজিত ছিলেন, তারা উৎসাহ হারিয়ে ফেলেছেন। কেননা, নতুন কোন কাজের সন্ধান তাদের কাছে নেই; পক্ষান্তরে, তাদের অনেকেরই বকেয়া বিল সরকারের কাছে পড়ে রয়েছে।

- উপজেলা পদ্ধতির পরিবর্তে উন্নয়ন কর্মকান্ড কেন্দ্রমুখী হয়ে পড়ায় গ্রামীণ অর্থ সঞ্চলন (money circulation) হ্রাস পেয়েছে এবং পল্লীর জনসাধারণের ক্রয় ক্ষমতাও হ্রাস পেয়েছে।

- স্থানীয় পর্যায়ে যে সকল মামলার মীমাংসা সহজেই করা সম্ভব ছিল আদালত স্থানান্তরের ফলে তাও কঠিন হয়ে পড়ে। ফলে জনসাধারণের ভোগান্তি যেমন বেড়েছে তেমনই মামলা পরিচালনার ব্যয়ভারও বহুগুণ বেড়ে গেছে ।

- দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালত উপজেলা থেকে পুনরায় জেলা সদরে স্থানান্তরের ফলে উপজেলাকেন্দ্রিক তরুণ আইনজীবীবৃন্দ বিরূপ ও কঠিন বাস্তবতার মুখোমুখী হয়েছেন।

এ সকল সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রতিক্রিয়া বিবেচনায় রাখলে উপজেলা পদ্ধতি বাতিল করাকে সরকারের পেছনের দিকে হাঁটা হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। হয়তোবা এ সকল বিষয় বিবেচনায় রেখেই ড. আতিউর রহমান উপজেলা পরিষদের বিলুপ্তির সিদ্ধান্তকে ময়লা জল ফেলতে গিয়ে বালতি ফেলে দেয়ার সাথে তুলনা করেছেন (আহমেদ ১৯৯৮ : ১৩২)।

রাজনৈতিকভাবেও উপজেলা বিলুপ্তিকে সহজভাবে গ্রহণ করা হয়নি। উপজেলা পরিষদের মাধ্যমে যে উন্নয়ন প্রক্রিয়ার সূচনা হয়েছিল তৃণমূল পর্যায়েও তার ইতিবাচক প্রভাব প্রতিফলিত হতে শুরু করেছিল। ফলে জনসাধারণ উপজেলা পদ্ধতির বিলুপ্তিতে হতাশ ও বিক্ষুব্ধ হয়েছেন। উপজেলা বিষয়ে জনমত ও একাডেমিক সার্কেলের আগ্রহ লক্ষ্য করে আওয়ামী লীগ তাদের দ্বিতীয় পাঁচ বছরের (১৯৯৬-২০০১) শাসনকালে উপজেলা পুনঃপ্রবর্তনসহ চার স্তরের একটি স্থানীয় সরকার কাঠামো দিয়ে আইন প্রণয়ন সম্পন্ন করেছেন। কিন্তু শুধুমাত্র ইউনিয়ন পরিষদের সংরক্ষিত আসনে তিনজন মহিলা সদস্যের সরাসরি নির্বাচনের ব্যবস্থা ছাড়া আর কোন আইন এ সরকার বাস্তবায়ন করে যেতে পারেননি।

২০০১ খ্রিষ্টাব্দে অনুষ্ঠিত জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রাক্কালে জনমতের কথা বিবেচনায় রেখে দেশের প্রধান দু'টি রাজনৈতিক দল তাদের নিজ নিজ নির্বাচনী ইশতেহারে উপজেলা ব্যবস্থা পুনঃপ্রবর্তন বিষয়ে সুস্পষ্ট অঙ্গীকার ঘোষণা করে। ক্ষমতাসীন বিএনপি'র নির্বাচনী ইশতেহারের ''৩.৬ স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা'' শীর্ষক শিরোনামে উপজেলা প্রসঙ্গে দেয়া বক্তব্য থেকে উদ্বৃত করা হল,''প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণের লক্ষ্যে উপজেলা পরিষদ এবং জেলা পরিষদ গঠন এবং পরিকল্পিত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সেগুলিকে সকল উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত করার সক্রিয় উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে'' (সূত্র: উজ্জীবক বার্তা, ৪১ তম সংখ্যা, এপ্রিল ২০০২)।

পক্ষান্তরে, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহারে ''১২. স্থানীয় সরকার ও জনগণের ক্ষমতায়ন'' শীর্ষক শিরোনামে যে অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয় তা থেকে অংশবিশেষ উদ্বৃত করা হচ্ছে, ''(ক) বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ ও জনগণের ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে তৃণমূল পর্যায়ে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে সুদৃঢ় করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। গ্রাম পরিষদ, ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ ও জেলা পরিষদ-এই চার স্তর বিশিষ্ট স্বায়ত্তশাসিত শক্তিশালী স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে সংসদে আইন পাশ করা হয়েছে। আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করলে সর্বাগ্রে জেলা পরিষদ ও উপজেলা পরিষদের নির্বাচনসহ সকল স্তরে নির্বাচন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে স্থানীয় নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ইতিমধ্যে গৃহীত আইন ও স্থানীয় সরকার কমিশনের সুপারিশের আলোকে প্রয়োজনীয় ক্ষমতা ও দায়িত্ব হস্তান্তর করবে'' (সূত্র: উজ্জীবক বার্তা, ৪১ তম সংখ্যা, এপ্রিল ২০০২)।

২০০১ খ্রিষ্টাব্দের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিএনপি'র নেতৃত্বাধীন চারদলীয় জোট নিরংকুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে জয়লাভ করে এবং নতুন সরকার গঠিত হয়। সংশ্লিষ্ট সকলেই আশা করেছিলেন যে, বিএনপি'র নির্বাচনী অঙ্গীকার অনুযায়ী সহসাই উপজেলা পরিষদ গঠিত হবে এবং এ পরিষদের নির্বাচনও অনুষ্ঠিত হবে। সরকার নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের জন্য একটি মন্ত্রিসভা কমিটিও গঠন করেছেন। এর মধ্যে বিগত ২৭ ফেব্রুয়ারী ২০০২ খ্রিষ্টাব্দের 'প্রথম আলো' পত্রিকায় 'উপজেলা নিয়ে তীব্র মতবিরোধ' শীর্ষক একটি খবর প্রকাশিত হয়। প্রতিবেদনটি থেকে জানা যায়, ''উপজেলা ব্যবস্থা নিয়ে সরকার সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছে। সরকার কর্তৃক নিয়োজিত মন্ত্রিসভা কমিটি উপজেলা প্রশ্নে দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়েছে। একটি পক্ষ চান উপজেলা পরিষদের নির্বাচিত চেয়ারম্যান স্থানীয় উন্নয়ন কার্যক্রমে নেতৃত্ব দিন। অপর পক্ষ চান উপজেলায় স্থানীয় সংসদ সদস্যদের পরামর্শক্রমে সব উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালিত হোক। শেষোক্ত গ্রুপ উপজেলা নামটিরও বিরোধিতা করছেন। তারা চান স্থানীয় সরকারের এই স্তর উপজেলা'র পরিবর্তে 'থানা উন্নয়ন ও সমন্বয় কমিটি' নামে পরিচিত হোক। মন্ত্রিসভা কমিটির এই গ্রুপ স্পষ্টতই উপজেলার গুরুত্ব হ্রাস করতে আগ্রহী। কারণ তারা ক্ষমতা হ্রাস করার প্রস্তাব করেই ক্ষান্ত হচ্ছেন না, তারা উপজেলা নামটিরও বিলোপ চান, যাতে উপজেলা স্তরে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা কখনো মাথা তুলতে না পারে'' (জাহাঙ্গীর ২০০২ক :৭)। সরকারের মধ্যকার এ ধরনের মতভেদের প্রসঙ্গটি সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশিত হওয়ার পর একাডেমিক সার্কেলে পুনরায় উপজেলা নিয়ে লেখালেখির সুত্রপাত হয়। উপজেলা বিষয়ে সরকারের দোদুল্যমানতার জন্য ড. মাশরাফী বিএনপি'র অন্তর্গত আইনজ্ঞ লবিকে দায়ী করেছেন। আইনজ্ঞ লবির এই অবস্থানকে হেস্টিংসীয় অবস্থান হিসেবে আখ্যায়িত করে তিনি লিখেছেন, ''এই লবিটি উপজেলা স্তর থেকে বিচার প্রক্রিয়াকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য পুরো উপজেলা ব্যবস্থাকে বাতিল করবার ব্যবস্থা করেছিল। অথচ তখন উপজেলা ব্যবস্থা ছিল জনকল্যাণকর, জনপ্রিয় এবং ইতিবাচক অর্থে বিকাশমান'' (মাশরাফী ২০০২খ : ৫)। এর মধ্যেই সংবাদ মাধ্যমে একটি হতাশাব্যঞ্জক ব্যাপারও বেরিয়ে এসেছে। বিএনপি'র নির্বাচনী ইশতেহারে উপজেলা ব্যবস্থা বাস্তবায়নের যে অঙ্গীকার ছিল সেটিকে এখন বলা হচ্ছে- 'কৌশলগত' অঙ্গীকার (প্রথম আলো ২৮-০২-২০০২)। যদি একথা সত্যি হয়ে থাকে তা হলে তাতে রাজনৈতিক দলের গণবিচ্ছিন্নতা যেমন প্রকট হয়ে উঠে তেমনি সাধারণ মানুষের সঙ্গে প্রবঞ্চনার বিষয়টিও স্পষ্ট হয়ে উঠে। এ দুটোই যুগপৎ অগণতান্ত্রিক ও প্রহসনমূলক (মাশরাফী ২০০২খ : ৫)। এ বিতর্কের অবসান ঘটানোর সর্বোত্তম পন্থাটি হ'ল নির্বাচনী অঙ্গীকার রক্ষা করে একটি জনপ্রতিনিধিত্বশীল ও কার্যকর উপজেলা ব্যবস্থা প্রবর্তন করা।

৪. স্থানীয় সরকারের উপ-স্তর

বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা বিষয়ে সাংবিধানিক নির্দেশনায় অস্পষ্টতা; এবং স্থানীয় সরকার বিষয়ক আইনের জটিলতার সুযোগে প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর দলীয় স্বার্থ রক্ষা ও তৃণমূল পর্যায়ে সমর্থক সৃষ্টি ও লালন ইত্যাদি উদ্দেশ্যে বাংলাদেশে স্থানীয় সরকারের আনুষ্ঠানিক স্তরসমূহের পাশাপাশি স্থানীয় সরকারের সৎভাই হিসেবে নানারকম অনানুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার প্রয়াস অতীতে লক্ষ্য করা গিয়েছে; বর্তমানেও যাচ্ছে । ১৯৭১-১৯৭৫ কালপর্বে গঠিত বিতর্কিত 'রিলিফ কমিটি' এবং গ্রাম সমবায় (প্রস্তাবিত) দিয়ে এ উদ্যোগের সূচনা হলেও পরবর্তী শাসকগণ এজাতীয় উদ্যোগের সুফল (!) বিষয়ে অতিশয় আস্থাশীল থেকেছেন (যদিও শাসকবর্গ পূর্ববর্তী শাসক দল এবং দলীয় নেতৃত্বের সমালোচনায় সদা মুখরিত থাকেন)। ১৯৭৬-১৯৮২ কালপর্বের গ্রাম সরকার ও যুব কমপ্লেক্স; ১৯৮২-১৯৯০ কালপর্বের পল্লী পরিষদ; ১৯৯৬-২০০১ কালপর্বে গ্রাম পরিষদ (প্রস্তাবিত) গঠন কিংবা গঠনের প্রয়াস এ ক্ষেত্রে দৃষ্টান্ত হিসেবে উল্লেখ করা যায়। ১৯৭১-৭৫ কালপর্বের ইউনিয়ন রিলিফ কমিটি ছিল যুগপৎ আলোচিত ও সমালোচিত একটি ব্যবস্থা। স্থানীয় সংসদ সদস্য, এবং স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতৃত্ব কর্তৃক রিলিফ কমিটির সদস্যগণ মনোনীত হতেন বলে এ প্রতিষ্ঠানটি ব্যাপক দলীয়করণের মুখে পতিত হয়। গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামোয় দলীয় অবস্থানকে সুসংহতকরণ; আর্থিক সুবিধাদি বিতরণের মাধ্যমে দলীয় কর্মী সমর্থকদের আর্থ-সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধিকরণ; ইত্যাদি উদ্দেশ্য অর্জনের হাতিয়ার হিসেবে রিলিফ কমিটি ব্যাপক মাত্রায় ব্যবহৃত হয়েছিল বলে মনে করা হয়। ফলতঃ আওয়ামী লীগের ব্যাপক জনসমর্থনে ধ্বস নামার অন্যতম কারণ হিসেবেও রিলিফ কমিটিকে দায়ী করা হয়।

১৯৭৬-১৯৮২ কালপর্বেও আমরা একই রকম ব্যাপার লক্ষ্য করি। এ সময়ে ১৯৭৭ খ্রিষ্টাব্দের ১৩-৩১ জানুয়ারী বাংলাদেশে ইউনিয়ন পরিষদসমূহের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নবনির্বাচিত ইউ-পি নেতৃত্বের মধ্যে তৎকালীন শাসক গোষ্ঠীর সমর্থকদের সংখ্যা ছিল খুবই সীমিত । ফলে শাসকগোষ্ঠী স্থানীয় সরকারের এই স্তরটিকে (ইউনিয়ন পরিষদ) 'পরাস্ত' করতে তৎপর হয়ে ওঠেন এবং বিকল্প শক্তি হিসেবে গ্রাম সরকার গঠন করেন (আহমেদ : ১৯৯৩) । স্বভাবতঃই গ্রাম সরকারের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল মেকি গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে গ্রাম পর্যায়ে দলীয় সংগঠন বিস্তার ও সমর্থক সৃষ্টির মাধ্যমে 'নয়া কর্তৃত্ববাদ'

প্রতিষ্ঠা করা (Zaman : 1989)। যা হোক, আর্থিক সমস্যাবলী; প্রয়োজনীয় ক্ষমতার অভাব; নেতৃত্বের কোন্দল; ও প্রাতিষ্ঠানিক দ্বন্দ্বের কারণে গ্রাম সরকার ব্যর্থ হয় (Faizullah : 1987)। ১৯৮২ সালে সামরিক সরকারের হাতে গ্রাম সরকারের বিলুপ্তি ঘটে। গ্রাম সরকার গঠন বিষয়ে দেশের একজন প্রবীণ আমলা এবং সাবেক সচিব মোহাম্মদ সিরাজুদ্দীন একটি বাস্তব ও আকর্ষণীয় চিত্র একেঁছেন। তাঁর বক্তব্য থেকে উদ্বৃত করা হ'ল, ''আমার জেঠা শামসুল হক এ আইনের (এখানে ১৯৮০ খ্রিষ্টাব্দে সংশোধিত স্থানীয় সরকার আইন, ১৯৭৬ এর কথা বলা হয়েছে) ফাঁক খুঁজে নিয়ে নিজেকে (গ্রাম সরকারের) চেয়ারম্যান, জেঠাইমাকে মহিলা প্রতিনিধি, তাঁর এক ছেলেকে যুব প্রতিনিধি, এক মেয়েকে যুবতী প্রতিনিধি, এক ছেলেকে ভূমিহীন, এক ভাইকে প্রান্তিক চাষী ইত্যাদি পদে নির্বাচন / মনোনয়ন দান করে আমাদের হাস্যরসের উদ্রেক করেছিলেন (সিরাজুদ্দীন ২০০২ : ৫)। হুবহু না হলেও একই রকম ঘটনার পুনরাবৃত্তির কথা নানা সূত্রে উল্লেখ করা হয়। সম্ভবতঃ এ সকল কারণে দ্বিতীয়বার ক্ষমতায় এসে (১৯৯১-১৯৯৬) শাসক দল বিএনপি গ্রাম সরকার প্রসঙ্গে উৎসাহ দেখায়নি। কিন্তু দ্বিতীয় মেয়াদে বিএনপি সরকার (১৯৯১-১৯৯৬) গ্রাম সরকার নিয়ে তেমন কিছু না বললেও ২০০১ এর জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে প্রকাশিত নির্বাচনী ইশতেহারে পুনরায় গ্রাম সরকার বিষয়ে অঙ্গীকার ঘোষণা করে। ইশতেহারে বলা হয়েছে ''স্থানীয় শাসনকে তৃণমূল পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া এবং গ্রাম পর্যায়ে যোগ্য নেতৃত্ব সৃষ্টির লক্ষ্যে গ্রাম সরকার ব্যবস্থাকে পুনরায় প্রতিষ্ঠা এবং বেগবান করা হবে।'' উপজেলা নিয়ে বিতর্কের প্রেক্ষাপটে সরকার এখন গ্রাম সরকারের পরিকল্পনা নিয়ে এগুচ্ছে মর্মে জনকণ্ঠ একটি রিপোর্ট প্রকাশ করেছে (হক ২০০২ : ৩)। অতীতের অভিজ্ঞতায় আমরা দেখেছি, তৃণমূল পর্যায়ে দলীয় সমর্থকদের ক্ষমতা সুসংহতকরণ কিংবা দলীয় প্রভাব বলয় বৃদ্ধি; ইউনিয়ন পরিষদের বিকল্প একটি ক্ষমতাকেন্দ্র ও সমর্থন বলয় সৃষ্টি; এবং এর মাধ্যমে স্থানীয় সরকার পরিষদের নির্বাচনে পরাজিত দলীয় কর্মীদের পুরস্কৃতকরণ ছাড়া এজাতীয় অনানুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠানের তেমন কোন ইতিবাচক ভূমিকা নেই। বরং ইউনিয়ন পরিষদের সঙ্গে ক্ষমতা, এখতিয়ার, ও সম্পদ ভাগাভাগি নিয়ে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি; গ্রাম সরকার গঠনের জন্য প্রকাশ্যে মনোনয়ন পদ্ধতি অনুসরণের ফলে ব্যাপক দলীয় সংঘাত সৃষ্টির আশংকা, ইত্যাদির ফলে এ জাতীয় প্রয়াস তৃণমূল পর্যায়ে গণতন্ত্রের ভিত্তিকেই দুর্বল করে ফেলতে পারে।

৫. উপজেলা পরিষদে জাতীয় সংসদ সদস্যের ভূমিকা

স্থানীয় সরকারকে শক্তিশালী করতে হলে উপজেলা পরিষদের ভূমিকাকে খাটো করে দেখার অবকাশ নেই। যাঁরা উপজেলা পরিষদের বিরোধিতায় অবতীর্ণ হয়েছেন তাঁদের অবস্থান সঙ্গত কারণেই একটি কার্যকর ও দক্ষ স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার বিপক্ষেই যাচ্ছে। সংবাদ মাধ্যম সূত্রে জানা যায়, স্থানীয় উন্নয়ন কার্যক্রমে সংসদ সদস্যদের ভূমিকা কী হবে, উপজেলা চেয়ারম্যানদের সঙ্গে তাদের বিরোধ হবে কিনা - এটাই উপজেলা পরিষদ থাকা বা না থাকার বিতর্কের পেছনের কারণ (প্রথম আলো, সম্পাদকীয় : জুন ৪, ২০০২)। দ্বিতীয় আওয়ামী লীগ সরকার সপ্তম জাতীয় সংসদে উপজেলা আইন, ১৯৯৮ পাশ করার পর স্থানীয় জাতীয় সংসদ সদস্যকে উপজেলা পরিষদে উপদেষ্টার পদ দেয়ার বিধান করা হয়। বর্তমান সরকার সে ভূমিকাকে আরও জোরদার করার মাধ্যমে উপজেলা পরিষদকে জাতীয় সংসদ সদস্যের অধীনস্থ একটি প্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে উদ্যোগী হয়েছেন। এ জাতীয় নিয়ন্ত্রণের ফলে দেশে একটি শক্তিশালী স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকার ব্যবস্থার অনুকূলে বিরাজমান জনসাধারণের সাধারণ অভিপ্রায় পদদলিত হতে পারে, এমন আশংকা প্রবল।

উপজেলা পরিষদে স্থানীয় সংসদ সদস্যের ভূমিকা সম্পর্কে চলমান বিতর্কে সংবাদ মাধ্যম, স্থানীয় সরকার বিষয়ক গোষ্ঠী, এবং একাডেমিক সার্কেল উপজেলায় সংসদ সদস্যের ভূমিকার জোরালো বিরোধিতা করেছেন। জাতীয় সংসদ সদস্য এবং স্থানীয় সরকারের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মধ্যে মৌলিক একটি পার্থক্য রয়েছে। সংসদ সদস্যগণ আইন ও নীতি প্রণেতা। পক্ষান্তরে, স্থানীয় সরকারের প্রতিনিধিগণ মূলতঃ উন্নয়ন কর্মসূচিসমূহের বাস্তবায়নকারী এবং কিছু কিছু নাগরিক সেবা প্রদানের দায়িত্বপালনকারী। সুতরাং স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের রাজনীতিকীকরণ করা হলে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ রাজনৈতিক মতবিরোধীদের নাগরিক সেবাসমূহ এবং উন্নয়নের সুফল থেকে বঞ্চিত করতে উদ্যত হতে পারেন (Siddiqui 2000: 64) । আশির দশকের মাঝামাঝি থেকে শাসক দলের সাধারণ সম্পাদক / মহাসচিবগণকে স্থানীয় সরকার বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রীর দায়িত্ব প্রদান স্থানীয় সরকারের ক্রমবর্ধমান রাজনীতিকীকরণ প্রয়াসের প্রকাশ মাত্র। উপজেলা পরিষদের উপর সংসদ সদস্যের ভূমিকা বিষয়ে রাজনৈতিক সংস্কার প্রচারাভিযান-এর একটি প্রকাশনায় বলা হয়েছে, একটি স্বাধীন ও স্ব-শাসিত স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান ও সামগ্রিক স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার বিকাশ তাতে দারুনভাবে বাধাগ্রস্ত হবার আশংকা রয়েছে। উপজেলা পরিষদের উপর জাতীয় সংসদের নিয়ন্ত্রণ থাকবে নীতি ও আইনগত। একজন সংসদ সদস্যকে সংবিধান আইন পরিষদে ভূমিকা পালনের অধিকার দিয়েছে। তিনি একটি

নির্বাচিত স্থানীয় পরিষদের দৈনন্দিন কাজে হস্তক্ষেপ করবেন তা সংবিধানের ক্ষমতা পৃথকীকরণ নীতির বহির্ভূত কাজ (আহমেদ ২০০২ : ২৫)। আবার, এই বিতর্কে দুই প্রধান দলের মধ্যে বড় রকমের বিরোধ নেই। দুই প্রধান দলের নির্বাচিত এমপি'রা মনে করেন 'উপজেলা' তাদের জন্য একটা হুমকি। ... দু'টি বড় রাজনৈতিক দল তাদের দলীয় ও ব্যক্তিগত স্বার্থে 'স্থানীয় সরকার' ব্যবস্থাকে ঠুটো জগন্নাথে পরিণত করার চেষ্টা করছে। শুল্কমুক্ত গাড়ি আমদানি প্রশ্নে বড় দু'দলের এমপি'রা যেমন একমত হন, তেমনি উপজেলায় সংসদ সদস্যদের কর্তৃত্ব প্রশ্নেও তারা একমত (জাহাঙ্গীর ২০০২ক : ৭)। বিগত ৫ মার্চ ২০০২ ঢাকার সিরডাপ মিলনায়তনে নবগঠিত 'স্থানীয় সরকার সহায়ক গ্রুপ' আয়োজিত এক গোলটেবিল বৈঠকে অধিকাংশ বক্তাই উপজেলা পরিষদে সংসদ সদস্যদের কোন রকম ভূমিকা না রাখার পক্ষে মত দিয়েছেন (জাহাঙ্গীর ২০০২খ : ৫)। একজন উন্নয়ন বিশেষজ্ঞ লিখেছেন, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের উপর সংসদ সদস্যদের উপদেষ্টা হিসেবে ভূমিকা পালন একটি কার্যকর স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় সহায়ক নয়। সংসদ সদস্যদের জন্য এ ভূমিকা পালনকে উন্নয়নমূলক ভূমিকা হিসেবে চিহ্নিত করাও সঙ্গত নয় (Rahman 2002 : 4) । ড. শাহ দীন মালিক এর একটি উক্তি প্রথম আলো (৬ মার্চ ২০০২ ''স্থানীয় সরকার সহায়ক গ্রুপের আয়োজনে গোলটেবিল : গণতন্ত্রের প্রয়োজনে কেন্দ্রের প্রভাবহীন স্থানীয় সরকারের পক্ষে মত'' শীর্ষক প্রতিবেদনে) উদ্বৃত করেছে, 'আমাদের সংবিধানের তিনটি বিভাগ অনুসারে আইন প্রণেতারা প্রশাসনিক কাজ করতে পারেননা। ফলে স্থানীয় উন্নয়নে সাংসদদের কোন ভূমিকা রাখার সুযোগ নেই।' প্রথম আলোর সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে খ্যাতনামা অর্থনীতিবিদ ড. মুহাম্মদ ইউনূস বলেছেন, 'যদি এমন হয় যে স্থানীয় সরকারের কাজের ক্ষেত্রে সংসদ সদস্যের মতামত লাগবে, স্থানীয় সরকারকে তার কথামতো চলতে হবে, তখন দ্বৈত শাসন বা কর্তৃত্বমূলক একটা কিছু হয়ে যেতে পারে'' (প্রথম আলো, মার্চ ৩, ২০০২)। ১৭ ফেব্রুয়ারী ২০০২ খান ফাউন্ডেশন আয়োজিত 'তৃণমূল পর্যায়ে স্থানীয় শাসন নিশ্চিতকরণ' শীর্ষক এক গোলটেবিল বৈঠকেও স্থানীয় সরকারের উপর সংসদ সদস্যদের ভূমিকার ব্যাপক বিরোধিতা করা হয়। গোলটেবিল বৈঠকে সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা কাজী ফজলুর রহমান কেন্দ্রীয় সরকার দ্বারা স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণের বিরোধিতা করে বলেন, সাংসদদের প্রধান কাজ আইন প্রণয়ন করা। তারা গম বিতরণ করবেন এটা সংবিধানের কোথাও লেখা নেই। (প্রথম আলো, ১৮-২-০২ : ৭)। একজন প্রাবন্ধিক উপজেলা পরিষদে সংসদ সদস্যদের ভূমিকার বিরোধিতা করে লিখিত একটি নিবন্ধের উপসংহার টেনেছেন এই বলে, 'দেশে গণতন্ত্রের বিকাশ ও সে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় জনগণের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ বৃদ্ধির লক্ষ্যে স্থানীয় সরকারকে শক্তিশালী করে তোলার অংশ হিসেবেই উপজেলা

পরিষদে সাংসদদের অন্তর্ভুক্তির সাম্প্রতিক উদ্যোগ পরিহার করা উচিত বলে মনে করি'' (খান ২০০২ : ৪)। দেশের অন্যতম প্রাচীন সংবাদপত্র দৈনিক সংবাদ তার সম্পাদকীয়তে লিখেছে, ''... উপজেলায় স্থানীয় সংসদ সদস্যদের ভূমিকা নিয়ে বর্তমান সরকার একটি মারাত্মক জটিলতা সৃষ্টি করতে যাচ্ছে বলে আমরা মনে করছি। উপজেলা চেয়ারম্যানের ক্ষমতা ৫০ শতাংশ কমিয়ে তা স্থানীয় এমপি'দের নিয়ন্ত্রণে দেয়া; উপজেলা পরিষদ প্রাঙ্গণে স্থানীয় সংসদ সদস্যের স্থায়ী দপ্তর; উপজেলার জন্য বরাদ্দকৃত বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প স্থানীয় সংসদ সদস্যের মাধ্যমে ৫০ শতাংশ বাস্তবায়নের যে সর্বনাশা নীতি সরকার নিতে যাচ্ছে তাতে সন্দেহাতীতভাবে বলা যায়, সরকার উপজেলায় দ্বৈত শাসন এবং স্থায়ী বিরোধের বীজ বপন করছে'' (সংবাদ ৪-২-২০০২)। উদ্বিগ্ন একজন শিক্ষাবিদ লিখেছেন, 'সাংসদকে উপজেলা চেয়ারম্যানের ক্ষমতার অংশ ও উপজেলা পরিষদের বাজেটের অংশ খরচ করতে দেয়ার অধিকার দিলে একটি প্রহসনের সৃষ্টি হবে। আর তা আরও ব্যাভিচারধর্মী হবে যদি উপজেলার উন্নয়নের জন্য বছরে ১ কোটি টাকা প্রতি সাংসদকে দেয়া হয়। এটি অনেকটা ব্যক্তির দ্বারা রাষ্ট্র লুণ্ঠনের মতো ব্যাপারে পর্যবসিত হবে (মাশরাফী ২০০২ক : ৪)।

উপজেলা পরিষদের উপর সংসদ সদস্যের কর্তৃত্ব নিয়ে চলমান এ বিতর্কের মধ্যেই ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের একটি সার্কুলারের কথা সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশিত হয়, যাতে বলা হয়েছে, ''এখন থেকে স্থানীয় সংসদ সদস্য/তার অবর্তমানে জেলার দায়িত্বপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী/চীফ হুইপ/প্রতিমন্ত্রী/হুইপ/উপমন্ত্রী মহোদয়ের নির্দেশ মোতাবেক টি আর ও কাবিখা'র সব প্রকল্প প্রণয়ন করতে হবে। সেই সঙ্গে তাদের লিখিত সম্মতি নিয়ে প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি গঠন করতে হবে (তালুকদার ২০০২: ৪; সূত্র: দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের কাবিখা (রক্ষণাবেক্ষন) শাখার স্মারক নং- ২/৭০/২০০১-২০০২/১৪(৫৯২)/(১০৫৩) তাং- ৪-১২-২০০১ইং)। এ স্মারকের সূত্র ধরে খান ফাউন্ডেশনের পূর্বোক্ত গোলটেবিল বৈঠকে দু'জন সংসদ সদস্যসহ কয়েকজন আলোচক ইউনিয়ন পর্যায়ে টি আর ও কাবিখা'র গম বরাদ্দ থেকে সাংসদদের বাদ দেওয়ার সুপারিশ করেছেন (প্রথম আলো, ১৮-২-০২ : ৭)। অবশ্য পরবর্তীতে অন্য একটি সার্কুলার জারী করে পূর্বোক্ত সার্কুলারটি স্থগিত করা হয়।

উপজেলা পরিষদের উপর সংসদ সদস্যের কর্তৃত্ব প্রসঙ্গে ১৯৯২ সালে বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহম্মদ কর্তৃক আপিল বিভাগের পুরো বেঞ্চের পক্ষে দেয়া এক রায়ের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। রায়ে তিনি বলেন, ''স্থানীয় সরকার - স্থানীয় নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা স্থানীয় বিষয়গুলোর ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে গঠিত। যদি সরকারের কর্মকর্তা কিংবা তাদের তলপিবহদের স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলো পরিচালনা করতে আনা হয় তাহলে এগুলোকে স্থানীয়

প্রতিষ্ঠান হিসেবে রাখার কোন যৌক্তিকতা থাকে না'' (উজ্জীবক বার্তা, ৪১তম সংখ্যা : এপ্রিল ২০০২) । এ রায় যদি জাতীয় সংসদ সদস্য এবং তাঁদের প্রতিনিধিদের সম্পর্কেও প্রযোজ্য হয় তাহলে স্থানীয় সরকারের ব্যাপারে কোন প্রকার হস্তক্ষেপের সুযোগই তাঁদের (সংসদ সদস্য এবং তাঁদের প্রতিনিধিদের) নেই। একাডেমিক সার্কেল ও প্রচার মাধ্যমে সংসদ সদস্যদের উপজেলা / স্থানীয় সরকারের ক্ষেত্রে ভূমিকা পালনের যে প্রবল বিরোধিতা উঠে এসেছে এবং এখনো আসছে তার পেছনে রাজনৈতিক কোন অভিপ্রায় নেই। বরং এতে স্বায়ত্তশাসিত স্থানীয় সরকারের মাধ্যমে তৃণমূল পর্যায়ে গণতন্ত্রের ভিত্তিকে সুদৃঢ় করার আন্তরিক আগ্রহ ও দুর্নিবার ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটেছে। একই কারণে নিবন্ধকারও বিশ্বাস করেন যে, সংসদ সদস্যদের ভূমিকা শক্তিশালী স্থানীয় সরকার বিকাশে কোনক্রমেই সহায়ক নয়। এ বিতর্কের শেষ প্রান্তে একজন সাবেক সচিব ও কলামিস্ট জনাব মোহাম্মদ সিরাজুদ্দীন এর কতিপয় তীর্যক ও শ্লেষাত্মক মন্তব্য উদ্বৃত করার লোভ সংবরণ করতে পারছি না। তিনি লিখেছেন, ''উপজেলা চেয়ারম্যান একজন আঞ্চলিক নেতা, তিনি যে দলেরই হোন না কেন! তিনি উপজেলার প্রয়োজন নিরূপণ করবেন। যতো বেশী সম্ভব কেন্দ্রীয় সম্পদ আহরণ করবেন নিজস্ব এলাকার জন্য, নিজস্ব এলাকার সুপ্ত সম্পদ, প্রাপ্ত সম্পদ ব্যবহার করবেন, জনগণের স্বার্থে জনগণের অংশীদারিত্বের মাধ্যমে। তিনি ধর্না দেবেন এমপি সাহেবের কাছে যেনো তাঁর চাহিদা সরকার প্রধান, সাংসদগণ, দেশবাসী দাতাগোষ্ঠী জানতে পারে। কিন্তু বাস্তবে কি হয়? আমার সঙ্গে মর্নিং ওয়াক করেন যে সকল এমপি, তাঁদের একজন অকপটে বলেই ফেললেন, গম বিতরণ না করলে ভোট পাওয়া যাবে না পরবর্তী নির্বাচনে। ভোটের সঙ্গে গমের সম্পর্ক কী? আমার প্রশ্নের জবাবে তিনি বললেন, ভোটার জোগাড় করে ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান, দলের পাতি নেতা, এলাকার মিঞা ভুইয়াঁ চৌধুরী পাটোয়ারী। গম এদের আয়ের উৎস, পৃষ্ঠপোষকতার অবলম্বন। ইলেকশনের ব্যয় মিটিয়ে দু'পয়সা ঘরে তোলার উপায়! আমার মনে হলো আমি বুঝতে শিখছি, কেনো মন্ত্রী মেয়র হতে চান, এমপি চেয়ারম্যান হতে চান। আমার মনে হলো আমি একটি বোকার হদ্দ! একত্রিশ বৎসর সিএসপিগিরি করেও চিনতে পারিনি গম কি জিনিস! অথবা আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কেনো হযরত আদম ও বিবি হাওয়াকে গম খেতে নিষেধ করেছিলেন'' (সিরাজুদ্দীন ২০০২: ৫) ।

প্রস্তাবিত স্থানীয় সরকার কাঠামো

স্থানীয় সরকারের মাত্র দু'টি স্তর থাকবে। ইউনিয়ন পর্যায়ে - ইউনিয়ন পরিষদ, এবং উপজেলা পর্যায়ে - উপজেলা পরিষদ। পরবর্তী পৃষ্ঠার ছকচিত্রে বৃত্তাকার অংশটুকুই স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা নির্দেশক। অন্যান্য সংস্থাগুলোর সঙ্গে এ দু'টি স্তরের সম্পর্ক কার্যগত; কাঠামোগত নয়।

প্রস্তাবিত স্থানীয় সরকার কাঠামো

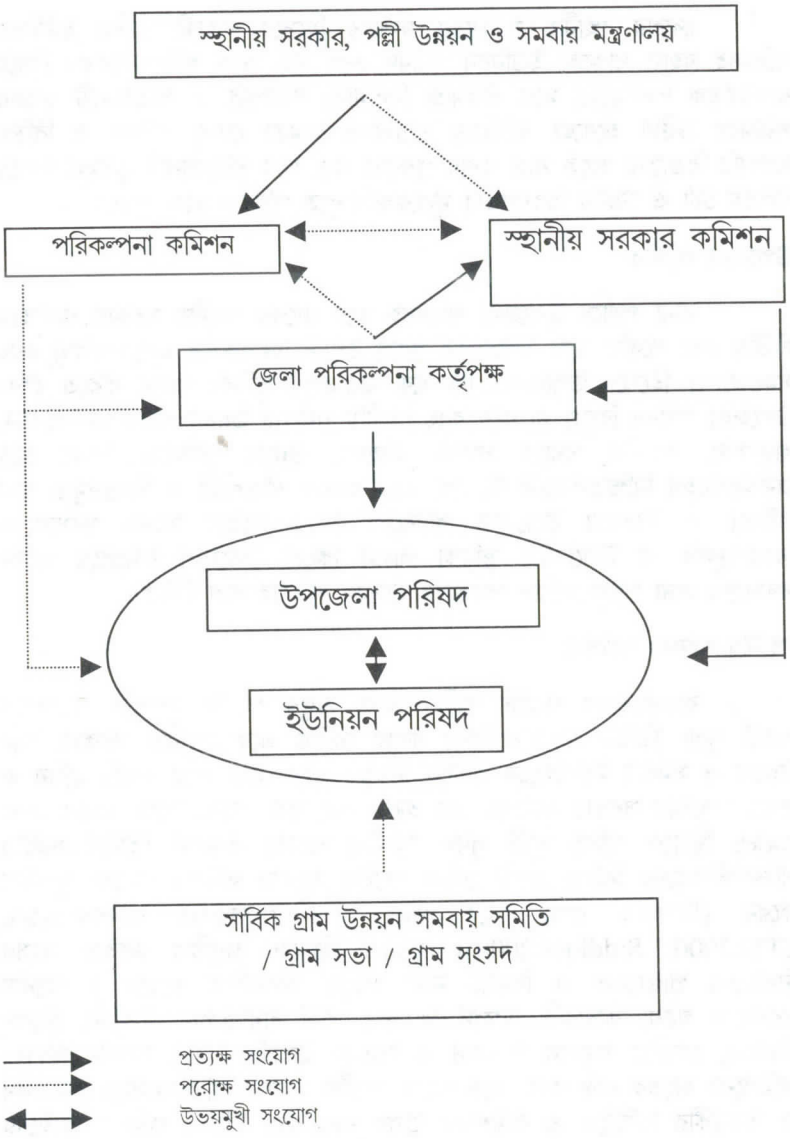

ইউনিয়ন পরিষদ

দেশের স্থানীয় সরকারের মূলস্তম্ভ হিসেবে শতাব্দী প্রাচীন ইউনিয়ন পরিষদই বহাল থাকবে। ইউনিয়ন পরিষদ এবং এর ভিত্তি শক্তিশালীকরণ বিষয়ে রাজনৈতিক দলসমূহের মধ্যে ঐকমত্য বিদ্যমান। সর্বোপরি, এ প্রতিষ্ঠানটি কালের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে। ইউনিয়ন পরিষদের ক্ষমতা জেলা পরিষদ ও বিভিন্ন সরকারি বিভাগের হাতে ন্যস্ত করার প্রবণতা বন্ধ হলে প্রতিষ্ঠানটি তৃণমূল পর্যায়ে গণতন্ত্র চর্চা ও উন্নয়ন তৎপরতার মূলকেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হতে পারবে।

উপজেলা পরিষদ

থানা পর্যায়ে উপজেলা পরিষদই হবে দেশের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার দ্বিতীয় এবং সর্বোচ্চ স্তর। উপজেলার সকল উন্নয়ন তৎপরতার মূলকেন্দ্রবিন্দু এবং সমন্বয়কেন্দ্র হিসেবে উপজেলা পরিষদকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে। উপজেলা পরিষদ বিলুপ্ত না করে বরং স্থানীয় পর্যায়ের উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, স্থানীয় পর্যায়ে সম্পদ আহরণ, উন্নয়ন প্রক্রিয়ার সকল স্তরে জনঅংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণের উদ্দেশ্যে একে আরও শক্তিশালী ও নিয়ন্ত্রণমুক্ত করা উচিত। এ উদ্দেশ্যে উপজেলা পরিষদের উপর জাতীয় সংসদ সদস্যগণের নিয়ন্ত্রণমূলক বা উপদেষ্টার ভূমিকা পালন কিংবা উপজেলা কমপ্লেক্সে সংসদ সদস্যদের জন্য পৃথক অফিস স্থাপনের উদ্যোগ পরিহার করা উচিত।

স্থানীয় সরকার কমিশন

বাংলাদেশের শতাব্দী প্রাচীন অথচ ভঙ্গুর স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাকে একটি সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা করার নিমিত্ত একে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত করে একটি স্বাধীন ও স্বতন্ত্র 'স্থানীয় সরকার কমিশন' এর হাতে ন্যস্ত করা যেতে পারে। ১৯৯২ এবং ১৯৯৬ খ্রিষ্টাব্দে গঠিত দু'টি পৃথক স্থানীয় সরকার কমিশন স্থানীয় সরকার শক্তিশালীকরণের নিমিত্ত একটি স্বাধীন স্থানীয় সরকার কমিশন গঠনের সুপারিশ করেন (বিস্তারিত দেখা যেতে পারে, স্থানীয় সরকার কমিশন: ১৯৯৭; CPD:2000; Siddiqui:2000)। ২০০১ খ্রিষ্টাব্দে অনুষ্ঠিত জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রাক্কালেও এ বিষয়টি নানা মহলে আলোচিত হয়েছে । স্থানীয় সরকারের গঠন, কার্যাবলী, সম্পদ সংস্থান, কর্মী ব্যবস্থাপনা, নির্বাচন, বিরোধ মীমাংসা, কেন্দ্রীয় অনুদান বিভাজন ও বিতরণ ইত্যাদি দায়িত্ব স্থানীয় সরকার কমিশনের হাতেই ন্যস্ত করা যেতে পারে। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ পর্যবেক্ষণ ও তদারকীর দায়িত্বও এ কমিশনের উপর ন্যস্ত করা উচিত। কমিশন আইনের

অধীনে গঠিত একটি বিধিবদ্ধ সংস্থা হবে এবং এর কার্যকলাপের উপর মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণ বা প্রশাসনিক কর্তৃত্ব থাকবেনা (স্থানীয় সরকার কমিশনের সম্ভাব্য দায়িত্ব ও কার্যাবলী সম্পর্কে বিস্তারিত দেখা যেতে পারে, স্থানীয় সরকার কমিশন ১৯৯৭ : 23; Siddiqui 2000 : 63-66)।

জেলা পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষ

নতুন আঙ্গিকে উপজেলা পরিষদ গঠন করা হলে জেলা পরিষদের প্রয়োজন ফুরিয়ে যাবার কথা। বিভিন্ন গবেষণায়ও জেলা পরিষদকে বিলুপ্ত করার সুপারিশ করা হয়েছে (Faizullah 1982:364-65)। সর্বোপরি, বাংলাদেশে বিগত তিন দশকে নির্বাচিত জেলা পরিষদ হিসেবে কোন প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্বই ছিলনা। অতএব, জেলা পরিষদের কাল্পনিক অস্তিত্ব নিয়ে বিতর্কে না জড়িয়ে মধ্যপন্থা হিসেবে জেলা পরিষদকে রূপান্তরিত করে জেলা পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষ গঠন করা যেতে পারে। জেলার দায়িত্বপ্রাপ্ত ডেপুটি কমিশনারকে পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষের প্রধান নির্বাহী হিসেবে দায়িত্ব দেয়া যেতে পারে। জেলা পর্যায়ের সকল সরকারি, আধা-সরকারি বিভাগের আঞ্চলিক / স্থানীয় প্রধানগণ জেলা পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষের সদস্য হবেন। জেলার সকল সংসদ সদস্য পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষের উপদেষ্টা হতে পারেন (Quddus. et al.1995)। জেলা পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষের অধীনেই জেলার ভৌগলিক সীমানাভুক্ত সকল ইউনিয়ন পরিকল্পনা বইয়ের সমন্বয়ে উপজেলা পরিকল্পনা বই; এবং সকল উপজেলা পরিকল্পনা বইয়ের সমন্বয়ে জেলা পরিকল্পনা বই প্রণয়ন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা যেতে পারে। বাংলাদেশে পরিকল্পনা কমিশনের সহায়তায় জেলা পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষ জেলাভুক্ত সকল গ্রামের গ্রাম তথ্য বই (Village Information Book) প্রণয়নপূর্বক সে সকল বইয়ের সমন্বয়ে জেলা তথ্য বই প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে (Quddus. *et al.* ১৯৯৫)।

সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি / গ্রাম সভা / গ্রাম সংসদ

গ্রাম বা ওয়ার্ড পর্যায়ে মনোনয়ন পদ্ধতির মাধ্যমে কোন রকম স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান গঠন না করাই শ্রেয়। এ প্রচেষ্টার সম্ভাব্য নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে বর্তমান প্রবন্ধে পূর্বেই আলোকপাত করা হয়েছে। একান্তই কিছু করতে হলে বিবেচনার জন্য এখানে তিনটি বিকল্প তুলে ধরা হল:

প্রথম বিকল্প:

মনোনীত কোন অস্থায়ী প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার চেয়ে গ্রামের সকল নারী, পুরুষ ও শিশু-কিশোরের জন্য উন্মুক্ত সদস্য পদের ব্যবস্থা রয়েছে এমন একটি 'সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি' বা অনুরূপ কোন সংগঠন গড়ে তোলা যায়।

তবে এ সংগঠনটিকে কোনভাবেই স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান হিসেবে গণ্য করা হবেনা। সদস্যপদের প্রকৃতির বিচারে এটা অবশ্যই স্থানীয় পর্যায়ের সমষ্টি সংগঠন হিসেবে কাজ করবে। এক গ্রাম-এক সংগঠন ভিত্তিতে গঠিত এই সমিতি কৃষি উন্নয়ন; সেচ ব্যবস্থাপনা; হাঁস-মুরগী ও পশুসম্পদ উন্নয়ন; মৎস্য সম্পদ উন্নয়ন; শিক্ষা বিস্তার; মহিলা ও শিশু উন্নয়ন; সামাজিক বনায়ন ও পরিবেশ উন্নয়ন; গ্রাম তথ্য বই ও গ্রাম পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন ইত্যাদি কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করতে পারে। সদস্যদের প্রত্যক্ষভোটে নির্বাচিত সমিতির সভাপতি ইউনিয়ন পরিষদের ভোটাধিকারবিহীন সদস্য হিসেবেও দায়িত্ব পালন করতে পারেন।

দ্বিতীয় বিকল্প:

প্রতিটি ইউনিয়নের ৯টি ওয়ার্ডকে একক ধরে নিয়ে ওয়ার্ডের সকল ভোটারের সমন্বয়ে এক একটি গ্রাম সংসদ / গ্রাম সভা গঠন করা যেতে পারে। দারিদ্র্য বিমোচন; এ জাতীয় প্রকল্পের আওতায় আনার যোগ্য ব্যক্তি/পরিবার চিহ্নিতকরণ; বয়স্ক শিক্ষা ও প্রাথমিক শিক্ষা উৎসাহিতকরণ; ওয়ার্ড পর্যায়ে পারিবারিক তথ্য সংগ্রহ করে ওয়ার্ড তথ্য বই প্রণয়ন; ওয়ার্ডের জন্য প্রকল্প চিহ্নিত করে অগ্রাধিকার ভিত্তিক তালিকা প্রণয়ন ইত্যাদি কাজসহ প্রস্তাবিত গ্রাম সরকারের জন্য নির্বারিত কার্যাবলী এ সংসদের উপর ন্যস্ত করা যেতে পারে। পশ্চিম বঙ্গে অনুরূপ একটি সংগঠন সাফল্যের সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে কাজ করছে (বিআরডিবি - জাইকা, ২০০২)। এ সংগঠনটি স্থানীয় সরকারের আনুষ্ঠানিক কাঠামোর বাইরে থাকবে; তবে ইউনিয়ন পরিষদের সঙ্গে এর ঘনিষ্ট উন্নয়নমূলক সম্পর্ক থাকবে। ইউনিয়ন পরিষদ গ্রাম সংসদের সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডে উন্নয়ন কার্যক্রম সংগঠিত করবে। যেহেতু সকল ভোটারের জন্য সদস্যপদ উন্মুক্ত থাকবে সেহেতু কোন প্রকার নির্বাচন / মনোনয়ন পদ্ধতি এবং তৎসংশ্লিষ্ট সংঘাত সংঘর্ষের আশংকাও এক্ষেত্রে থাকবেনা।

তৃতীয় বিকল্প:

গ্রাম সংসদ দ্বিতীয় বিকল্প অনুযায়ী গঠিত হবে, এবং এর নির্বাহী কমিটি হিসেবে গ্রাম সরকার বা অনুরূপ কোন পরিষদ সরাসরি নির্বাচনের মাধ্যমে গঠন করা যেতে পারে। গ্রাম সংসদের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালনের লক্ষ্যে নির্বাহী ক্ষমতা গ্রাম সরকারের উপর ন্যস্ত থাকবে। উভয় ক্ষেত্রে প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর গ্রাম সংসদের সাধারণ সভা, এবং প্রতি বছর জুন মাসের শেষ সপ্তাহে বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হবে। গ্রাম সরকার কিংবা গ্রাম সংসদ উভয় ক্ষেত্রেই সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের নির্বাচিত ইউপি সদস্য পদাধিকার বলে পরিষদের সভাপতি হবেন।

উপসংহার

বাংলাদেশের বিগত পঞ্চাশ বছরের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা পর্যালোচনা করলে চাঞ্চল্যকর ও চমকপ্রদ যে তথ্যটি পাওয়া যায় তা হ'ল, এ দেশে যখনই সামরিক শাসকগণ ক্ষমতায় এসেছেন তখনই স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার উপর অত্যধিক গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। আবার সামরিক শাসনের অবসানের পর নির্বাচিত বেসামরিক ও দলীয় সরকার স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাকে অবহেলা করেছেন কিংবা এদিকে যথাযথ মনোযোগ দেননি । ফলতঃ অবস্থাটা এমন হয়েছে যে, যখন কেন্দ্রে শক্তিশালী গণতান্ত্রিক সরকার থাকে, স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা তখন দুর্বল ও ভঙ্গুর হয়ে পড়ে; আবার কেন্দ্রে সামরিক বা অগণতান্ত্রিক সরকার থাকলে তারই সঙ্গে শক্তিশালী ও গণভিত্তিক স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা তৈরী হতে শুরু করে। এ প্রবণতা অত্যন্ত বেদনাদায়ক হলেও সত্য। তবে সুখের কথা এই যে, বিগত দশকটিতে (১৯৯১-২০০১) স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা বিষয়ে দেশে ব্যাপকভিত্তিক আলোচনা, পর্যালোচনা, গবেষণা ইত্যাদি অব্যাহত ছিল এবং এখনও রয়েছে। বিগত দু'দশকে স্থানীয় সরকার বিষয়ে তিন তিনটি কমিশন গঠিত হয়েছে। প্রত্যেক কমিশনই তাঁদের নিজেদের মত করে কার্যকর ও শক্তিশালী স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠার সুপারিশ পেশ করেছেন এবং সরকারও সে অনুযায়ী অনেক কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন।

বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা যতই সমস্যা সংকুল থাকুক না কেন, প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলসমূহ এবং সরকার একটি শক্তিশালী স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠার বিষয়ে যথেষ্ট আন্তরিক বলেই প্রতীয়মান হয়। ১৯৯১, ১৯৯৬, এবং সর্বশেষ ২০০১ খ্রিষ্টাব্দে অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনে রাজনৈতিক দলসমূহের নির্বাচনী ইশতেহারে স্থানীয় সরকারের বিষয়টি গুরুত্বসহকারে স্থান পেয়েছে। তিনটি স্থানীয় সরকার কমিশনের সুপারিশেও একটি ঐকমত্যের বাতাবরণ বহুলাংশে তৈরী হয়ে রয়েছে। রাজনৈতিক পট পরিবর্তিত হলে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায়ও যেনতেনভাবে পরিবর্তন ঘটাতেই হবে, এমন অবিবেচনাপ্রসূত একটি ধারণা এ দেশে প্রচলিত রয়েছে যা স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার বিকাশে সহায়ক নয় । স্থানীয় সরকারের ক্ষেত্রে এ জাতীয় পরিবর্তনের ফলেই এ দেশে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা এখনও শেকড় নিতে পারেনি। অতএব, এরকম কর্মকৌশল ত্যাগ করে প্রকৃত গণতান্ত্রিক চেতনা এবং বিকেন্দ্রীকরণের মৌলিক উদ্দেশ্য পূরণে অধিকতর তাৎপর্যপূর্ণ বলে বিবেচিত হলেই কেবল স্থানীয় সরকার পদ্ধতির সংস্কার সাধনে তৎপর হওয়া উচিত। অন্যথায় অর্থহীন পরীক্ষা-নিরীক্ষা স্থানীয় সরকারের সম্ভাবনাই বিনাশ করতে পারে।

<u>তথ্য নির্দেশিকা</u>

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার (২০০০); **গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান**

আহমেদ, ড. তোফায়েল (১৯৯৮); **স্থানীয় সরকারের সংস্কার ভাবনার দুই দশক** (ভোলা : কোস্ট ট্রাস্ট) ।

আহমেদ, ড. তোফায়েল (২০০২); **শক্তিশালী স্থানীয় সরকার গণতন্ত্র, সুশাসন ও সুষম উন্নয়নের পূর্বশর্ত** (ঢাকা : রাজনৈতিক সংস্কার প্রচারাভিযান) ।

ইউনুস, ড. মুহাম্মদ (২০০২) ''স্বাধীন ও শক্তিশালী স্থানীয় সরকার হলে মাস্তানতন্ত্র টিকবে না'' (সাক্ষাৎকার) **প্রথম আলো** (৩ মার্চ ২০০২ খ্রি.) ।

করিম, জোবায়ের এনামুল (১৯৯১), ''বাংলাদেশের গ্রামীণ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ'' **লোক প্রশাসন সাময়িকী,** ২য় সংখ্যা; (ঢাকা : বিপিএটিসি) ।

খান, আবু তাহের (২০০২), ''উপজেলা পরিষদে সাংসদদের ক্ষমতাদানের প্রশ্ন আসছে কেন?'' **সংবাদ** (১০ ফেব্রুয়ারী-২০০২ খ্রি.) ।

জাহাঙ্গীর, মুহাম্মদ (২০০২ক), ''স্থানীয় সরকার বিতর্ক : উপজেলা নিয়ে আলোচনা হোক'' **প্রথম আলো** (১২ মার্চ ২০০২ খ্রি.) ।

জাহাঙ্গীর, মুহাম্মদ (২০০২খ), ''উপজেলা, সংসদ সদস্য ও কেন্দ্রের প্রভাবমুক্ত স্থানীয় সরকার'' **যুগান্তর** (৫ এপ্রিল ২০০২ খ্রি.) ।

বদিউজ্জামান, মোঃ (১৩৯৬), ''বাংলাদেশের প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ : একটি সমীক্ষা'' **প্রশাসন সমীক্ষা,** ৩য় বর্ষ, ২য় সংখ্যা, (ঢাকা: বিপিএটিসি)।

বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার (১৯৮০)। **দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ১৯৮০-৮৫** (ঢাকা: বাপক)।

বিআরডিবি ও জাইকা, ২০০২, **পশ্চিম বঙ্গ শিক্ষা সফর প্রতিবেদন,** পার্টিসিপেটরী রুরাল ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট, (ঢাকা: বিআরডিবি)।

মজুমদার, ড. বদিউল আলম, (২০০২), ''স্থানীয় সরকার শক্তিশালীকরণের যৌক্তিকতা'' **উজ্জীবক বার্তা** (এপ্রিল ২০০২)।

মাশরাফী, ড. মখদুম (২০০২ক), ''সাংসদ বনাম স্থানীয় সরকার'' **যুগান্তর** (২৩ জানুয়ারী ২০০২ খ্রি.)।

মাশরাফী, ড. মখদুম (২০০২খ)। ''উপজেলা বিতর্ক : আইনজ্ঞ লবীর হেস্টিংসীয় অবস্থান'' **ইত্তেফাক** (১২ মার্চ ২০০২ খ্রি.)।

মেনন, রাশেদ খান (২০০১), **সাপ্তাহিক ২০০০** (১৬ নভেম্বর ২০০১ খ্রি.)।

মোরশেদ, হেদায়েত হোসাইন (২০০২); ''স্থানীয় সরকার ও ক্ষমতার বিকেন্দ্রিকরণ ঃ প্রসঙ্গ সিটি করপোরেশন''; **আজকের কাগজ** (৩০ এপ্রিল ২০০২ খ্রি.)।

তালুকদার, মোঃ নাদিম (২০০২), ''তার চেয়ে ইউনিয়ন পরিষদ বিলুপ্ত করাই ভালো'' (চিঠি)' **ভোরের কাগজ** (১৯ জানুয়ারী ২০০২ খ্রি.) ।

দি হাঙ্গার প্রজেক্ট (২০০২), **উজ্জীবক বার্তা** (এপ্রিল ২০০২, ৪১ তম সংখ্যা)।

সিরাজুদ্দীন, মোহাম্মদ (২০০২), ''শাসন সংলাপ: কেন্দ্রীয় সরকার বনাম স্থানীয় সরকার'' **ইত্তেফাক** (১২ ফেব্রুয়ারী ২০০২ খ্রি.)

হক, রেজোয়ানুল (২০০২); ''উপজেলা পরিষদ গঠন চিন্তা স্থগিত'' **জনকণ্ঠ** (২৩ জানুয়ারী ২০০২ খ্রি.)।

Alderfer, Harold F. (1964). **Local Government in Developing Countries** (New York: McGraw-Hill Book Co.).

Ali, Quazi Azhar (1995). **Decentralized Administration in Bangladesh** (Dhaka : University Press Ltd.).

CPD, (2000). **Strenghening Local Government: Recent Experience and Future Agenda** (Dhaka : CPD).

Faizullah, M. (1982). "Zila Parishad in Bangladesh : A Case Study of Sylhet. **Journal of BARD,** Comilla, Hasnat Abdul Hye (ed) (1986)

Decentralization, Local Government Institutions and Resource Mobilization, (Comilla : BARD)

Faizullah, M. (1987). **Development of Local Government in Bangladesh** (Dhaka : NILG).

International Encyclopaedia of Social Sciences (1960). (New York: Macmillan Co.).

Quddus, Md. Abdul; Barua, Bijoy Kumar; and Ahmed, Tofail (Eds. 1995) **Participatory District Planning : A Framework for Action** (Comilla : BARD)

Rahman, Dr. Hossain Zillur (2002). "The Challenges of Decentralization" **The Daily Star** (25 March 2002).

Siddiqui, Kamal (ed) (1995). **Local Government in Bangladesh** (Dhaka: UPL).

Siddiqui, Kamal (2000). **Local Governance in Bangladesh : Leading Issues and Major Challenges** (Dhaka : UPL).

Zaman, M.Q (1989). "Ziaur Rahman: Leadership Styles and Mobilization Policies" **The Indian Political Science Review** Vol. XVIII, No. 2-3.